ঘরে ঘরে ইন্টারনেট

মোস্তাফা জব্বার

সদ্য অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঘরে ঘরে ইন্টারনেট পৌঁছানো আর বাধ্যতামূলক কমপিউটার শিক্ষা প্রসারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতি প্রশংসা পাবার দাবি রাখে। তবে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার, এ স্বপ্নটা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা কোথায় এবং এজন্য কোন কোন পদক্ষেপ নিতে হবে।

সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিল চূড়ান্ত করেছে বলে দৈনিক প্রথম আলো খবর ছেপেছে (দৈনিক প্রথম আলো, ২১ জুন ২০১১, পৃষ্ঠা ১-১৫-http://www.prothom-alo.com/detail/date/2011-06-21/news/163972)। এরপর ২২ জুন এনইসিতে এটি অনুমোদিত হয়। ২২ জুনের প্রথম আলো পত্রিকায় ছাপা খবরে জানা যায়, দলিলটির অন্যতম অগ্রাধিকার আইসিটি। ২০১৫ সালে সমাপ্য এই পরিকল্পনা দলিল যদি আরও অনেক আগেই অনুমোদিত হতো, তবে ভালো ছিল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে এর সূচনা ২০১০ সালে হওয়ার কথা। অন্তত এক বছর আগে দলিলটি চূড়ান্ত হলে সেটি দিয়ে ২০১০ সালেই কাজ শুরু করা যেত। পরিকল্পনা মেয়াদে বসে যদি দলিল চূড়ান্ত করতে হয় এবং এজন্য যদি পরিকল্পনা মেয়াদের কিছু সময় নষ্ট করে ফেলতে হয়, তবে তাকে দক্ষতা বলা যায় না। এতে বোঝা যায়, সময়মতো পরিকল্পনা করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। কার্যত সময় শুরু হওয়ার অনেক আগেই যদি পরিকল্পনা করা যায়, তবেই সেই দেশ অগ্রগতি সাধন করতে পারে। যাহোক, এখন আর সেসব কথা বলে লাভ নেই। সুখের কথা, এই পরিকল্পনায় সাতটি অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এসব অগ্রাধিকারে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির একটি হিস্যা আছে। প্রথম আলোর খবর অনুসারে, 'তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করা, টেলিঘনত্বের হার ৭০ শতাংশে উন্নীত করা, সব ইউনিয়নে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিসেন্টার বা ই-সেন্টার স্থাপন, সব ডাকঘরে কলসেন্টার স্থাপন, দ্বাদশ শ্রেণীতে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।'

জানি না, এর আগে আইসিটির কোনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার খাত ছিল কি না। মনে পড়ে না, কখনও কোনো পরিকল্পনায় আইসিটি খাতে কোনো লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছিল কি না। এই সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার যে ঘোষণা দিয়েছিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার কিছুটা হলেও ছাপ থাকায় সরকারকে অভিনন্দন। যদিও এই পরিকল্পনা মেয়াদে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরও কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত ছিল, তথাপি একেবারে কিছুই না থাকার জায়গায় কিছু একটা থাকছে এটাই বড় কথা।

শুরুতেই এটি স্পষ্ট করা দরকার, ব্রডব্যান্ড বলতে আসলে আমরা কী বুঝি। উইকিপিডিয়া অনুসারে ব্রডব্যান্ড হলো : Although various minimum bandwidths have been used in definitions of broadband, ranging from 64 kbit/s up to 4.0 Mbit/s, the 2006 OECD report defined broadband as having download data transfer rates equal to or faster than 256 kbit/s, while the United States (US) Federal Communications Commission (FCC) as of 2010, defines "Basic Broadband" as data transmission speeds of at least 4 megabits per second, downstream (from the Internet to the user's computer) and 1 Mbit/s upstream (from the user's computer to the Internet).

...এই সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার যে ঘোষণা দিয়েছিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার কিছুটা হলেও ছাপ থাকায় সরকারকে অভিনন্দন। যদিও এই পরিকল্পনা মেয়াদে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরও কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত ছিল, তথাপি একেবারে কিছুই না থাকার জায়গায় কিছু একটা থাকছে এটাই বড় কথা...

বাংলাদেশের ব্রডব্যান্ড নীতিমালা অনুসারে ১২৮ কেবিপিএস গতিকে ব্রডব্যান্ড বলা হয়। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিনিউকেশন ইউনিয়নের মতে ব্রডব্যান্ড হলো : The International Telecommunication Union Standardization Sector (ITU-T) recommendation I.113 has defined broadband as a transmission capacity that is faster than primary rate ISDN, at 1.5 to 2 Mbit/s.

(সূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_Internet_access)

আজকের দুনিয়াতে একটি দেশ কতটা উন্নত তার প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবহারকে বিবেচনা করা হয়। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই ঘরে ঘরে ইন্টারনেট পৌঁছানোর যুদ্ধ চলছে। সিঙ্গাপুর এরই মাঝে তাদের জনসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছে দিয়েছে। জাপান ও কোরিয়ার অবস্থা আরও ভালো। এমনকি ভারতেও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসার দ্রুতগতিতে চলছে। মালয়েশিয়া প্রতিটি বাড়িতে ১ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। ব্রিটেন ডিজিটাল ব্রিটেন নামের একটি কর্মসূচির আওতায় বিশেষ কর আরোপ করে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসার ঘটাচ্ছে। ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের দিক থেকে আইটিইউর তালিকার শীর্ষস্থানের ১৪টি দেশ সম্পর্কে মতামত তুলে ধরে।

আইটিইউ যে হিসাব দিয়েছে, তাতে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী চৌদ্দটি শীর্ষ দেশের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই চৌদ্দটি দেশের প্রথম তিনটি দেশই এশিয়ার। এই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে কোরিয়া। এই দেশটি সর্বোচ্চ ৫-এর মাঝে ৪.৪ পেয়ে শীর্ষে রয়েছে। এরপর রয়েছে জাপানের অবস্থান। জাপানের স্কোর হলো ৪.৩। সিঙ্গাপুরের অবস্থান ৩ এবং স্কোর ৪.২। ৫-এর মাঝে ৪ বা তার বেশি পেয়েছে ইউরোপের আর মাত্র ৩টি দেশ। এগুলো হলো : সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের ৪.১ এবং এস্তোনিয়ার ৪.০। ৩-এর ঘরে আছে মোট ৫টি দেশ। এগুলো হলো : ফ্রান্স ৩.৯, স্পেন ৩.৭, নেদারল্যান্ডস ৩.৬, অস্ট্রেলিয়ার ৩.৪ ও আমেরিকার ৩.০। ১৪টিতে আরও যে দেশ আছে সেগুলো ইউরোপের। দেশগুলো হলো : ইতালি ২.৯, যুক্তরাজ্য ২.৭, জার্মান ২.৬ এবং গ্রিস ২.৪। দুনিয়ার বাকি দেশগুলোর অবস্থা আলোচনার বাইরেই রাখা যায়। যে কয়টি মাপকাঠিতে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলো হলো :

01. What targets are set for next-generation network (NGN) speed and

coverage? 02. By when do governments want to see basic broadband services universally available, and what does 'basic' mean in terms of speed? 03. How do countries compare in terms of universal and NGN broadband targets? 04. How much public funding has been pledged for the attainment of these targets and how do countries compare? 05. How are governments acting to facilitate the plans through regulation and by intervening directly in market and network development? 06. What role does the private sector play in government plans? 07. What is the current status of the plans and of industry involvement in them?

উপরে উল্লেখিত যেসব মাপকাঠিতে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের শীর্ষ তালিকা প্রণীত হয়েছে, তার কোনটি অনুসারেই আমরা তালিকার সবচেয়ে নিচের জায়গাটিতেও বসতে পারব না। বরং এই তালিকার কোনো না কোনো অবস্থানে কবে যাব, সেটিও আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

লক্ষণীয়, তালিকার শীর্ষস্থানগুলো এশিয়ার। বাকিগুলোর মধ্যে একটি মাত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সবই ইউরোপের। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে গ্রিসের অবস্থান নিচে। আমরা বাংলাদেশ এসব তালিকার কোথাও অবস্থান করি না। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন হলো, আমাদের এই উচ্চাভিলাষী টার্গেটটি বাস্তবায়িত হবে কেমন করে। কেমন করে দেশের শতকরা ৩০ ভাগ মানুষের কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছানো হবে? এই প্রশ্নটি করার প্রধান কারণ হলো, এখন দেশের শতকরা একটি মানুষও প্রকৃত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে না। কয়েকটি শহরের সীমিত সংখ্যক কয়েক হাজার মানুষ হয়তো এই সুবিধা পায়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট তো সুদূরের কথা, শুধু ইন্টারনেটও ব্যবহারযোগ্য হতে পারেনি।

তবে এখন এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের সবাই উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। ইন্টারনেট ছাড়া না হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ, না হবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বা না আমরা একটি নতুন যুগে পা ফেলতে পারব। এই যুগটাকে ইন্টারনেট যুগ বলি। এই সভ্যতাটিকে বলি ইন্টারনেট সভ্যতা। আগামী এক দশকে এটি আরও স্পষ্ট হবে, দৃশ্যমান হবে এবং আমরা অনুধাবন করব, ইন্টারনেট হচ্ছে আমাদের জীবনরেখা। সেই ইন্টারনেট সভ্যতার যুগে যদি ইন্টারনেট আলোচনার মধ্যবিন্দু এবং কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র না হয় এবং জনগণ যদি এর সাথে সহজে-সুলভে যুক্ত হতে না পারে, তবে কোনোভাবেই আমরা সঠিক কাজ করছি বলে মনে হয় না।

কোনো কোনো সূত্র অনুসারে, এ দেশে বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭০ লাখ। এই হিসাবটা কতটা সঠিক আমি জানি না। কারণ, যারা এই সেবা দেয় তাদের সবার হিসাব যোগ করলে আঙ্কটা এত বেশি হয় না। তবে একটি সংযোগ অনেক মানুষ ব্যবহার করতে পারে এই বিবেচনায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। শুরুতে ইন্টারনেট মানেই ছিল আইএসপি। তবে এখন প্রকৃতপক্ষে আইএসপির চেয়ে অনেক বেশি গ্রাহক মোবাইল অপারেটরদের। বাস্তবতা হলো ৭০ লাখের মধ্যে হয়তো ৬২ লাখেরও বেশি গ্রাহক শুধু মোবাইল সংযোগ দিয়েই ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

যদিও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা এত বিশাল জনগোষ্ঠীকে ইন্টারনেট সেবা দেয় না, তবুও এই খাতের প্রতিনিধি প্রকৃতপক্ষেই ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার সমিতি। দীর্ঘদিন ধরেই আমরা হাতে হাত ধরে কাজ করছি। পরস্পরের সুখে-দুঃখে আমরা একে অপরের পাশে থেকেছি। তথ্যপ্রযুক্তির কোনো বিষয় হলেই আমরা এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাই। কিন্তু ইন্টারনেটের বিষয় হলে এই সমিতিকে বিটিআরসি এবং টেলিকম মন্ত্রণালয়কে খুঁজতে হয়, যেখানে আমাদের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। তবুও তাদের কাছ থেকে শুনে এবং পত্র-পত্রিকা পড়ে একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, ইন্টারনেট বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির সবচেয়ে অবহেলিত একটি বিষয়। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারেরা তাদের গলার আওয়াজ উঁচু করতে পারে না। অনেক কষ্টে তাদের ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করা হয়, কিন্তু মূল সমস্যার কোনো সমাধান এখনও আমরা দৃশ্যমান দেখতে পাই না।

...ব্রিটেনে যখন শতকরা ৯০ ভাগ ঘরবাড়িতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসারের কথা বলা হচ্ছে, তখন আমরা টার্গেটই করেছি শতকরা ৩০ ভাগের। প্রথমত আমরা আগামী প্রজন্মের নেটওয়ার্ক নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছি। এই প্রথম আমরা ২০১৫ সালে শতকরা ৩০ ভাগ মানুষকে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছি। দ্বিতীয়ত আমরা ইউনিভার্সাল ও এনজিএনের পার্থক্যই বুঝি না...

সম্প্রতি ব্রিটেন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসারের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। গত ১৭ আগস্ট ২০১১ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়: ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের গ্রাম ও দুর্গম অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের উন্নতির জন্য ৩৬ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ড বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্যের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী জেরেমি হান্ট গত সোমবার এ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন। যুক্তরাজ্য সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ ঘরবাড়ি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ চালু করার যে পরিকল্পনা করেছে, তা বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হচ্ছে এই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া। বরাদ্দ করা অর্থের মধ্যে ইংল্যান্ডের কাউন্টিগুলো পাবে ২৯ কোটি ৪০ লাখ পাউন্ড। স্কটল্যান্ড পাবে ৬ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড। যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রী জর্জ অসবোর্ন অবশ্য এ খাতে ৫৩ কোটি পাউন্ড বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সংস্কৃতিমন্ত্রী জেরেমি হান্ট বলেন, আমাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য এবং জনগণকে সেবা দেয়ার জন্য দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক, এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক দেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশের অনেক জায়গায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ নেই। আমরা এটা মানতে পারি না। তাই আমরা এ খাতে অর্থ বরাদ্দ করেছি। তিনি আরও বলেন, এই অর্থ বিভিন্ন কাউন্টির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ তারাই নেবে।

এটি লক্ষণীয়, ব্রিটেনে যখন শতকরা ৯০ ভাগ ঘরবাড়িতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসারের কথা বলা হচ্ছে, তখন আমরা টার্গেটই করেছি শতকরা ৩০ ভাগের। প্রথমত আমরা আগামী প্রজন্মের নেটওয়ার্ক নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছি। এই প্রথম আমরা ২০১৫ সালে শতকরা ৩০ ভাগ মানুষকে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছি। দ্বিতীয়ত আমরা ইউনিভার্সাল ও এনজিএনের পার্থক্যই বুঝি না।

আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত ইন্টারনেট হচ্ছে ন্যারোব্যান্ড বা মোবাইলভিত্তিক ব্রডব্যান্ড। ইন্টারনেট বলতে এখন তিন ধরনের সেবাকে বোঝায়। প্রথম ধরনের সেবাটি হলো তারভিত্তিক। কিছু আইএসপি ডিশের তারের মতো তারের সাহায্যে পাড়ায় পাড়ায় ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেয়। ৬৪ বা ১২৮ কেবিপিএস বা তার বেশি শেয়ারড ব্যান্ডউইডথ দেয়াকেই এরা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বলে। কিন্তু শেয়ারড হওয়ার ফলে কার্যক্ষেত্রে এসব কানেকশন প্রায় ডিপিআরএস বা এজ-এর মতোই স্বল্প গতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে এভাবে প্রকৃত ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেয়া সম্ভব। যদি এই ব্যান্ডউইডথটিকে শেয়ার না করে ডেডিকেটেড করা হয়, তবেই এটি করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে ব্রডব্যান্ড সেবাদানের দ্বিতীয় উপায়টি হলো ওয়াইম্যাক্স। বিশ্বজুড়ে ওয়াইম্যাক্স একটি স্বীকৃত তারবিহীন ইন্টারনেটপ্রযুক্তি। তবে এই প্রযুক্তি সমস্যাবিহীন নয়। দুনিয়ার অনেক দেশে এই প্রযুক্তি সফল হতে পারেনি। আমাদের দেশেও এর অবস্থা খুব ভালো নয়। এই সেবাদানের জন্য দেশে দুটি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স রয়েছে। এই সার্ভিস প্রোভাইডারদের একটি দেশের ৪০টি জেলায় সেবা আছে বলে দাবি করে। অন্য একটি দেশের ঢাকাসহ আরও কয়েকটি শহরে সেবা দিতে পারে বলে বিজ্ঞাপন দেয়। ওয়াইম্যাক্স নিয়ে সমস্যা হলো, এটি কোথায় কাজ করবে আর কোথায় কাজ করবে না সেটি বলা কঠিন। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো খুবই খারাপ। আমরা একটি ওয়াইম্যাক্স সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে একটি মডেম কিনে নিজের অফিসে কাজ করতে সক্ষম হলাম। কিন্তু সেই মডেমটি সেগুনবাগিচায় আমাদের একজন কর্মী তার বাসায় ব্যবহার করতে পারলেন না।

তৃতীয় সেবাটি একটি মোবাইল কোম্পানির। ▶

তারা ইভিডিও নামের একটি মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা দেয়। এর গতি প্রায় ৪ মেগাবিট পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের কাজের বর্তমানের চাহিদার তুলনায় একে যথেষ্ট বলা যেতে পারে। যারা চলতে-ফিরতে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তাদের জন্য এই সেবাটি তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে এই সেবাটিও দেশের সবখানে পাওয়া যায় না। ওরাও কয়েকটি শহরের মাঝে সীমিত হয়ে আছে। গ্রামে এই সেবা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। যেহেতু গ্রামে ব্যবহারকারী তেমন নেই, সেহেতু এই সেবার সম্প্রসারণও বাণিজ্যিকভাবে হয়ে উঠছে না। তবে যেহেতু এটি মোবাইল প্রযুক্তিনির্ভর, সেহেতু যেখানে ব্রডব্যান্ড বা ইভিডিও পাওয়া যায় না সেখানে সাধারণ মোবাইল ইন্টারনেট হিসেবে এটিকে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে ইন্টারনেটের বড় সঙ্কটের নাম এর মূল্য। এখনও দেশে ইন্টারনেটের দাম অনেক বেশি। এই দামে সাধারণ মানুষ এই সেবা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে না।

এমন একটি অবস্থা থেকে মাত্র ৪ বছরে জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগের কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছানো শুধু কঠিন হবে না, প্রায় দুরূহ মনে হতে পারে। কেননা ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এখনও তেমনভাবে ইতিবাচক কোনো কাজ করা হচ্ছে না। যেসব অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সেগুলোও হয়নি। আমাদের বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরও অনেক স্পষ্ট হবে। আমরা ইন্টারনেটের প্রসারের বাধাগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে পারি।

সাবমেরিন ক্যাবল : ইন্টারনেটের প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, এর অবকাঠামো তৈরি ও সহজলভ্য করা। কিন্তু এক সময় এদেশের সরকারের কাছে ইন্টারনেটের কোনো গুরুত্বই ছিল না। এরা ভাবেনি, এর কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নব্বই দশকের শুরুতে দুনিয়াজুড়ে ইন্টারনেটের বিস্তার হতে থাকলেও ১৯৯৬ সালের আগে এদেশে ইন্টারনেট বলতে ছিল শুধু অফলাইন ই-মেইল সেবা। কেউ কেউ ঢাকা থেকে বিদেশে ফোন করে ই-মেইল বিনিময় করতেন। ১৯৯৬ সালে আমরা ভি-স্যাট স্থাপন করে অনলাইন ইন্টারনেটের যুগে পা ফেলি। সেই পা ফেলা ছিল খুবই দুর্বল। কারণ, ইন্টারনেটের জন্য প্রয়োজন ছিল দ্রুতগতির সংযুক্তি। সেটি আমাদের ছিল না। সেটি আমরা নিতেও চাইনি। আমাদের নীতিনির্ধারক, সরকার ও আমলারা এর গুরুত্বই বুঝেনি। সে জন্য ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের সামনে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে যখন সাবমেরিন ক্যাবল লাইন (সিমিউই-৩) স্থাপিত হয়, তখন তৎকালীন সরকার সেই লাইনে যুক্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ সেই সংযুক্তিটি ছিল বিনামূল্যের। তখনকার সরকারের পক্ষ থেকে অজুহাত দেখানো হয়, ওই সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হলে দেশের সব তথ্য পাচার হয়ে যাবে। এরপর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে সাবমেরিন ক্যাবল লাইন স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তৎকালীন মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারেনি। অবশেষে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে আমরা সাবমেরিন ক্যাবলে (সিমিউই-৪) যুক্ত হই। কিন্তু এরপরও সেই সাবমেরিন ক্যাবল ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এই সম্পদটিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের রয়েছে অবহেলার চরম দৃষ্টান্ত। এক সময় কক্সবাজারের সৈকতে এই সাবমেরিন ক্যাবলকে উদোম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। যার নিরাপত্তা বলতে কিছু ছিল না। কক্সবাজার থেকে ঢাকা পর্যন্ত এর সংযোগ স্থাপন ও দেশব্যাপী এর ব্যবহারের অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এখনও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অতি সম্প্রতি এর ব্যান্ডউইডথ বাড়ানো হয়েছে (৪৪.৬ গি.বা. থেকে ১৪৪.৬ গি.বা.)। কিন্তু এর মাত্র ২২.৫ গি.বা. আমরা ব্যবহার করতে পারি। অথচ ২২.৫ গি.বা. ব্যান্ডউইডথ উন্নত দেশের ২২টি বাড়িতেই ব্যবহার করা হয়। আজকাল অন্তত ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ যেকোনো কিশোরের জন্য প্রয়োজন। কেউ কেউ গি.বা.তে ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করে।

দুর্ভাগ্য এখনও একটি সাবমেরিন ক্যাবল লাইনের মাঝেই আমরা বসে আছি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে একটি বিকল্প সাবমেরিন ক্যাবল লাইন স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সে বিকল্প এখনও কোনোভাবেই গড়ে ওঠেনি। দেশের ভেতরেও ঢাকা থেকে কক্সবাজার পথে একটি মাত্র বিকল্প সংযোগ রয়েছে, যার আরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

আমাদের সবেধন নীলমণি সিমিউই-৪ যদি কোনো কারণে বিপর্যস্ত হয়, তবে আমরা সারা দুনিয়া থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। গত ৬ আগস্ট ২০১১ ওয়াইম্যাক্স সেবাদাতা কিউবি তাদের গ্রাহকদেরকে ই-মেইলে নোটিস দিয়ে এমন তথ্য দিয়েছে, This is to notify you that concerned authority will be carrying out submarine cable (Under Sea) maintenance work from 2 AM to 4 AM on 7th August (Sunday) 2011. Due to this, users will not be able to use internet during that period. This will be applicable for all the Internet users across Bangladesh.

সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের সাড়ে পাঁচ বছর এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার পৌনে তিন বছর পর আমরা এমন একটি নোটিস পাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা আশা করেছিলাম, কোনো না কোনোভাবে আমরা দুনিয়ার সাথে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। ৭ আগস্টের মিডিয়ার খবরে জানলাম, সত্যি সত্যি রাত ২টা ৪০ মিনিট থেকে ভোর ৪টা ২০ মিনিট দুনিয়ার কেউ আমাদের সাথে ইন্টারনেটে যোগাযোগ করতে পারেনি। অথচ দেড় ঘণ্টার জন্য এমন কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে থাকব আমরা, এটি কল্পনারও অতীত। অবশেষে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ খবর প্রকাশিত হয়, সরকার শেষ পর্যন্ত টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগ পাওয়ার জন্য ৬টি লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা এমন একটি অবস্থাতে থেকে কোনো জাদুকরি কিছু করতে না পারলে ২০১৫ সালে শতকরা ৩০টি ঘরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছাতে পারব সেটি অনেকটাই অসম্ভব।

ইন্টারনেটের ব্যয় : বাংলাদেশে ইন্টারনেট প্রসারের সবচেয়ে বড় বাধা এর খরচ। আমরা এখন ৩-৪ কিলোবাইট গতির ইন্টারনেটের জন্য যে অর্থ ব্যয় করি, তা দিয়ে উন্নত দেশ এমনকি আমাদের পাশের দেশ ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার আরও অনেক দেশেই এমবিপিএস গতি পাওয়া যায়। দুনিয়ার অনেক শহরের পুরোটাই বিনামূল্যে ওয়াইম্যাক্সের সুবিধা পায়। কার্যত দুনিয়ার কোনো দেশেই এত বেশি অর্থ দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয় না। আমাদের দেশে এক এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের দাম গত আগস্ট মাসে ১০ হাজার টাকা হয়েছে। এক সময় এই ব্যান্ডউইডথের ব্যয় ১ লাখ ২৭ হাজার টাকা ছিল। বর্তমান সরকার একে ১০ হাজারে নামিয়েছে। এজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু সরকারের এই খাতে প্রতি এমবিপিএস হাজার খানেক টাকার বেশি খরচ হয় না। ফলে প্রকৃত ব্যয়ের ১০ গুণ বেশি দামে ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করার সরকারি প্রয়াস কোনোভাবেই সরকারের ঘোষিত নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমনকি সরকার এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের অনুরোধ বা বক্তব্যও শোনে না।

শুধু ব্যান্ডউইডথের দাম নয়, ইন্টারনেট ব্যবহারে আরোপিত শতকরা ১৫ ভাগ ভ্যাট। এটি প্রত্যাহার করার জন্য বছরের পর বছর অনুরোধ করা হলেও প্রত্যাহার করা হয়নি।

ইন্টারনেটের প্রসারের আরেকটি বাধা মডেম ও অন্যান্য ফোন সেটের দাম। এখনও দেশে একটি ইন্টারনেট মডেম কিনতে অন্তত দেড় হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। এর ওপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক ধার্য করা রয়েছে। এই শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে এর দাম পাঁচশ' টাকার বেশি হতো না।

কনটেন্ট : আরও একটি সমস্যা। আমাদের তেমন প্রয়োজনীয় কনটেন্ট নেই। আমাদের দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা প্রধানত মেইল চালাচালি, চ্যাট করা, ফেসবুক, গুগল+ নিয়েই বেশি সময় কাটান। আমাদের নিজেদের কনটেন্ট নেই বললেই চলে। কিছু ব্লগ, পত্রিকাগুলোর অনলাইন সংস্করণ এবং সরকারের কিছু অপ্রয়োজনীয় তথ্য নিয়েই আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমাদের নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার জন্য এখনও অনলাইন কমার্স জমে ওঠেনি। শিক্ষামূলক দেশীয় কনটেন্ট এখানে নেই। অনেক অভিভাবক অভিযোগ করেন, ছেলেমেয়েদেরকে ইন্টারনেট দিলে ওরা নষ্ট হওয়া ছাড়া ভালো কিছু হয় না। কথাটি নির্মমভাবে সত্য। বাস্তবে আমাদের দেশের বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো ধরনের শিক্ষামূলক কনটেন্ট নেই। আমাদের নিজেদের কাজে লাগে তেমন তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়াই যায় না। অভাবটা দু'রকমের। প্রথমত নিজেদের তথ্য নেই। দ্বিতীয়ত নিজের ভাষায় তথ্য নেই। ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারের কোনো বিশেষ কারণ তৈরি হচ্ছে না। গত ২১ জানুয়ারি ডেইলি স্টার পত্রিকায় আমি খুব স্পষ্ট করেই বলেছি, কনটেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ►

প্রয়োজনীয় কনটেন্ট তৈরির জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার বরাদ্দও প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন জাগে, কেন ইন্টারনেটে সেবাসংকারী ও সরকার ইন্টারনেটের জন্য তেমন প্রয়োজনীয় কনটেন্ট তৈরি করে নাও হতে পারে তারা মানসিকভাবে এজন্য তৈরি নই। কোনো কোনো মোবাইল কোম্পানি ঈদ বা পূজার জন্য কাপড়ের গেট বানানো থেকে শুরু করে মোবাইলার স্পন্সর হতে শত শত কোটি টাকা শুধু বিজ্ঞাপনে খরচ করে। অপ্রয়োজনীয় স্পন্সর বা সিএসআরের এর কোনো হিসাবই নেই। অথচ ইন্টারনেট থেকে এখন তাদের আয় একেবারে শূন্য নয়। এখন গ্রামীণের মতো কোম্পানির আড়াই লাখ ইন্টারনেট সংযোগ আছে। সিটিসেল ভয়েস কলে পিছিয়ে থাকলেও ইন্টারনেটে এর অবস্থান দ্বিতীয়। ওরা প্রায় দেড় লাখ ইন্টারনেট সংযোগ দিয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় ইন্টারনেটের প্রসারের কনটেন্ট তৈরি করার জন্য এদের ব্যয় নেই।

ইন্টারনেটে শিক্ষার কনটেন্ট : সম্প্রতি এটি স্পষ্ট, ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায়। বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যাপকভাবে অবদান রাখতে পারে। এক সময় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রসারে যে ভূমিকা পালন করেছিল সেই কাজটি এখন ইন্টারনেটে আরও সুন্দর এবং চমৎকারভাবে করা যায়। এজন্য প্রয়োজন অবকাঠামো ও কনটেন্ট। অনেকেই নানা কারণে প্রতিষ্ঠানিক বা ফর্মাল শিক্ষায় যুক্ত হয়ে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন না। পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত হয়। এখন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেই শূন্যতার কিছুটা পূরণ হয়। এই ব্যবস্থায় কেউ আনুষ্ঠানিক বা নিয়মিতভাবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস না করেও পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে এবং সার্টিফিকেট পেতে পারে। যদি ইন্টারনেটে এই শিক্ষা আরও সহজ হয়ে পড়তে পারে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অনুশীলন কেন্দ্র প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি অনলাইনে সেই ব্যবস্থাটি প্রচলন করা যায় তবে আলাদা করে অনুশীলন কেন্দ্র থাকার প্রয়োজন নেই। ইন্টারনেটই হতে পারে সবচেয়ে বড় ক্লাসরুম। আশা করা যায়, আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে দেশের সর্বত্র দ্রুতগতির ইন্টারনেটের প্রসার ঘটবে। বিশেষ করে থ্রিজি প্রযুক্তিতে প্রবেশ করলে শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহার করার ব্যাপক সুবিধা পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি যদি শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারকে সুলভ করা যায় এবং যদি এর ব্যবহারের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করা যায়, তবে এটি শিক্ষার সবচেয়ে বড় বাহন হতে পারে। ইন্টারনেটে পাঠ্য বিষয়ের ইন্টারেক্টিভ কনটেন্ট রেখে দেয়া যেতে পারে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা অনুশীলন করবে এবং নিজেরা তাদের মূল্যায়নও করতে পারবে। ডিজিটাল কনটেন্ট বা মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট দিয়ে ক্লাস অনলাইনে করা আরও সহজ হতে পারে। সরকার ক্লাসরুমে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর দিচ্ছে। এদের জন্য তখন সিডি-ডিভিডিতে কনটেন্ট দিতে হবে। যদি সেই কনটেন্টগুলো ইন্টারনেটে রাখা যায় তবে খুব কমদামি নেটওয়ার্ক ডিভাইস দিয়ে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে ক্লাসরুমগুলোকে ডিজিটাল করা সম্ভব হবে। একটি বড় সুবিধার কথা মনে রাখা যেতে পারে। যদি আমরা কনটেন্ট তৈরি করার সময় মনে রাখি যে সেগুলো ইন্টারনেটেও ব্যবহার করা হবে বা যদি স্বাভাবিক কনটেন্টকে ইন্টারনেটের উপযোগী করে প্রকাশ করি তবে একই কনটেন্ট দু'ভাবেই ব্যবহার করা যাবে। আজ হোক কাল হোক, সরকারিভাবে হোক বা বেসরকারিভাবে হোক, আমাদের পাঠ্যবইকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করতেই হবে। কেউ না কেউ এই কাজটি করবেন এবং এখন যারা কেবলমাত্র কাগজের বই বা প্রথাগত ক্লাসরুমভিত্তিক লেখাপড়ার বাইরে কিছু ভাবতেই পারছেন না তারাও অনলাইন শিক্ষাকে সবচেয়ে সেরা শিক্ষার উপায় বলে বিবেচনা করবেন।

ইন্টারনেটের গতি : বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রধান সঙ্কটটি হচ্ছে এর কম গতি। এজন্য এর চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে অতি দ্রুত ইন্টারনেটের গতি বাড়ানো। এই গতি বাড়ানোর বিষয়টি প্রধানত অবকাঠামোনির্ভর। যে উপায়ে ইন্টারনেট সেবা দেয়া হয় তার ওপর নির্ভর করে ব্যবহারকারী কতটা গতি পেতে পারে। এই গতির বিষয়টা এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

...জানা গেছে, টেলিটকের মাধ্যমে থ্রিজির একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। একটি চীনা কোম্পানির সাথে এই বিষয়ে একটি চুক্তি সই হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। ২০১২ সালের ২৬ মার্চ টেলিটক ঢাকা ও চট্টগ্রামে থ্রিজি চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১২ সালে অন্য অপারেটররা থ্রিজি চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে...

ইন্টারনেট সেবাদানের প্রাচীনতম ও বহুল ব্যবহৃত উপায়টি হলো ক্যাবল লাইন। কিন্তু কালক্রমে তারবিহীন ব্যবস্থাও প্রচলিত হতে থাকে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন ইন্টারনেটের সেবা প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তবে এখন প্রশ্নটি কেবল ইন্টারনেটের প্রসার নয়, বরং এখন বিষয়টি হচ্ছে গতির। এই গতির বিষয়টি মানেই হচ্ছে ব্রডব্যান্ড। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে তারবিহীনভাবে প্রসারের যেসব উপায় আছে তার মাঝে রয়েছে মোবাইলের থ্রিজি নেটওয়ার্কসহ আরও কিছু প্রযুক্তি এবং ওয়াইম্যাক্স।

বাংলাদেশে ক্যাবল ব্যবহার করে ইন্টারনেট দেয়ার তেমন কোনো ব্যবস্থা এখনও কার্যকর নয়। এটি ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ এবং সম্ভবত প্রায় অসম্ভব। শহরগুলো এর আওতায় এলেও গ্রামে গ্রামে ক্যাবল পৌঁছানো কঠিন হবে। একই অবস্থা ওয়াইম্যাক্সের। এগুলোও শহরকেন্দ্রিক। ফলে ইন্টারনেটে বেশিরভাগ প্রসার ঘটেছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। গ্রামীণফোন এবং সিটিসেল এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু মোবাইলের বিদ্যমান থ্রিজি প্রযুক্তির গতি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বর্তমানের চাহিদার মাঝে নিয়ে আসতে পারে না। জিপিআরএস নামের যে প্রযুক্তি জিএসএম অপারেটরেরা ব্যবহার করে, তার গতি খুবই সীমিত। এতে মেইল চেক করা, ফেসবুক ব্যবহার করা বা ছোটখাটো ব্রাউজ করা বেশ ভালোভাবেই করা যায়। কিন্তু এখন ইন্টারনেট ব্যবহারের বড় চাহিদা হচ্ছে অডিও-ভিডিও। ব্রডব্যান্ড ছাড়া সেই অডিও-ভিডিও বিনিময় সহজ হয় না। আমি নিজে চেষ্টা করে দেখেছি, আমাদের ইডিজিও বা ওয়াইম্যাক্সেও তেমন গতি পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ হলো, অপারেটররা ব্যবহারকারীকে শেয়ারড ব্যান্ডউইডথ দেয়। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে তা হলো : ০১. যত দ্রুত সম্ভব থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালু করা। ০২. ওয়াইম্যাক্সকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করা। ০৩. দেশজুড়ে ক্যাবল লাইন স্থাপন করা।

থ্রিজি : আমাদের ধীরগতির ন্যারো ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটকে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ডে রূপান্তরের সহজ কাজটি হতে পারে শুধু থ্রিজি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আমরা জানি, আজকের দিনে জিপিআরএস বা সিডিএমএ প্রযুক্তি ইন্টারনেটে চলে না। যখন ইন্টারনেটে প্রবেশ করার সময় হয় তখন হয়তো এটি বেশ কাজে লাগে। কারণ তখন মেইল বা টেক্সটভিত্তিক সেবা আমাদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দিনে দিনে মানুষের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে তার ব্রডব্যান্ড সংযোগ দরকার হয়। আমরা ব্রডব্যান্ড নামের ইন্টারনেটের সেই সুবিধার সাথে এখনও প্রায় অপরিচিত। প্রথাগত আইএসপিগুলো তারের সহায়তায় রাজধানীতে সীমিত আকারের ব্রডব্যান্ড কানেকশন দেয়। এসবের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। সম্প্রতি তারবিহীন ব্রডব্যান্ড হিসেবে ওয়াইম্যাক্স চালু হয়েছে। তবে এর আওতাও খুব সীমিত। ওয়াইম্যাক্স সেবাদানকারী একটি কোম্পানির সেবা ঢাকায় সীমিত। অন্য কয়েকটি বিভাগীয় শহরে সীমিত সেবা দেয়া হচ্ছে। এসব প্রযুক্তি রাজধানী, বিভাগীয় বা জেলা শহর ছড়িয়ে কখনও গ্রামে যাবে সেটি ভাবা কঠিন। বরং দিনের পর দিন এসব প্রযুক্তির প্রসার তালাবদ্ধ থাকবে ও শহুরে ভাগ্যবানদের মাঝেই সীমিত থাকবে এটিই স্বাভাবিক। তেমন অবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে পারে থ্রিজি প্রযুক্তি।

জানা গেছে, টেলিটকের মাধ্যমে থ্রিজির একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। একটি চীনা কোম্পানির সাথে এই বিষয়ে একটি চুক্তি সই হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। ২০১২ সালের ২৬ মার্চ টেলিটক ঢাকা ও চট্টগ্রামে থ্রিজি চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১২ সালে অন্য অপারেটররা থ্রিজি চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আমাদের মনের মাঝে এখনও শঙ্কা কাজ করছে এ জন্য, ২০০৭ সাল থেকে বিটিআরসি এই প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলতে বলতে এবং কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে দেশের মানুষের মাঝে এক ধরনের হতাশা তৈরি করে ফেলেছে। তবুও আমরা আশায় বুক বাঁধছি।

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com